মহাভারতে যান ও বাহন কথা

জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ প্রাচীন মহাকাব্য হল মহাভারত, যা শুধু ভারে মহাভার নয় অসংখ্য কাহিনীর সে এক মহা - সংকলন। সেই মহাসংকলন মহাভারতে পাওয়া যায় সে যুগের যান ও বাহনের নানা তথ্য, নানা কথা। যা আমাদের ভাবায় এবং ভাবতে সাহায্য করে। সেই মহাকাব্য সৃষ্টি মূলে পাওয়া যায় একটি যান — নৌকা। মহাভারতের রচনাকার সেই নৌকায় জাত হয়েছিলেন। আর তাঁর সেই স্নেহময়ী জননী হয়েছিলেন এই মহাকাব্যের অনন্য এক নারী চরিত্র।

যমুনা নদীতে পারাপার করে একটি নৌকা, আর প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে সেই নৌকা বায় এক সুন্দরী রমণী-অতীব রূপ সম্পনাং সিদ্ধনামপি কাঙ্খিতাম! কি অপূর্ব রূপ তার, মুনিঋষির মন টলে যায়। এই সময় এক মুনি নাম - পরাশর, তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে নদীপারে যাবার উদ্দেশ্যে নদীতীরে পৌঁছেই দেখতে পেলেন সেই নৌ - পারাণীয়া রমণীর অপরূপ কমনীয় রূপ। আর রমণীয় মিষ্টি হাসি। "**দ্রষ্টেব স চা তাং দামাংশ্চক মে চারুহাসিনীম।**" (আদিপর্ব, ৫৮ অধ্যায়) কি অপূর্ব দেহ - সৌষ্ঠব, উরু দুটি যেন কদলী স্তম্ভং, রম্ভোরুং। সেই রূপ দর্শনে পরাশর মুনি মোহিত হয়ে ধীর পায়ে তাকে আকাঙ্খা করে এগিয়ে গেলেন সন্নিকটে। জিজ্ঞাসা করলেন : 'যে নাবিক নৌকা বয় সে কোথায়?' সুন্দরী জবাব দেয় স্মিত হেসে : 'আমিই সেই ধীবরের কন্যা, এখন আমিই নৌ পারাপার করি।'

—'শুভে তবে আমায় নিয়ে চলো পারে, আর কাল বিলম্ব কেন। আজ আমি তোমার শেষ পারাণীর যাত্রী হব।'

নৌকা চলতে শুরু করল। আর সেই মুনি তখন তৃষ্ণার্ত অপলক নয়নে পান করতে লাগলেন সেই নারীর অপরূপ রূপের ঝরণাধারা।

'আমি ধীবর কন্যা, লোকে আমার মৎস্যগন্ধা বলে'। —'জানি আরো জানি তোমার পূর্বজন্মের ইতিহাস যা তুমি জানো না, শোন।

সে ইতিহাস শুনে মৎসগন্ধা তাকিয়ে থকে সেই মহামুনির পানে। চোখে তখন তার তৃষ্ণা। আর নৌকা, সে চলছে তখন আপন বেগে তরতর করে, বইছে হিমেল বাতাস। কামনার শরে তখন পরাস্ত পরাশর। উত্তপ্ত শরীর, দৃষ্টিতে আগ্রাসী ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়জ্ঞান লুপ্ত প্রায়। বললেন : আমি তোমার নিকট পুত্র প্রার্থনা করি, সঙ্গম মম কল্যাণী। মৎস্যগন্ধা তখন রোমাঞ্চিত আনত নয়নে উত্তর দেয় — 'পারে কত লোকজন তারা দেখতে থাকবে এ সমাগম কী সম্ভব?'

মহর্ষি তখন সৃষ্টি করলেন কুয়াসা— সৃষ্টিতুং নীহারং। সঙ্গে সঙ্গে স্থানটি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল মুহূর্তে; এক আর্ষঋষির অভীপ্সায়, অন্ত্যজ ধীবর কন্যার গর্ভ সঞ্চারিত হল সমাগমে। জন্ম নিল এক মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। যুগ যুগান্তরের কবি আমদের প্রিয় ব্যাসদেব, যাঁর রচিত মহাকাব্য মহাভারত যুগোত্তীর্ণ এক বিস্ময়।

এ কাহিনী প্রায় আমাদের সবার কমবেশী জানা। আর এই জানা কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি নারীশক্তি ও নারী স্বাধীনতার ইঙ্গিত। এই কাহিনী প্রমাণ করে সেদিনের নারী ছিল স্বাবলম্বী। জীবিকা অর্জনে নৌকা বাওয়ার মত কঠিন কাজে নারী যে পারদর্শী ছিল এই কাহিনীই তার প্রমাণ।

নৌকাই পৃথিবীর প্রাচীন যান সে নিয়ে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু মহাভারতের যুগে যে স্বয়ংচালিত নৌকার ব্যবহার ছিল তা জানা যায় জতুগৃহ - দাহ নামক কাহিনীঅংশে।

নিঃশব্দ ঘন অন্ধকার, চারিদিক কুয়াশা ঢাকা, তার মধ্যদিয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে— ফেলে এগিয়ে আসে ছ'টি মানুষ। দূর থেকে চেনার উপায় নেই, সাদা কাপড়ে ঢাকা আপাদমস্তক। সামনের মানুষটির চেহারা বিশাল। তারই ইঙ্গিতে চলেছে অবশিষ্ট জনেরা তারই পিছু পিছু। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পৌঁছে গেল নদী কিনারে। সেখানে আছে একটি নৌকা। ছয়যাত্রী নৌকাতে আরোহণ করতেই তর্‌তর্‌ করে চলতে থাকে সেই নৌকা। আপন বেগে। না তার কোন মাঝি নেই, মাল্লা নেই, নেই হাল, নেই হাল, নেই দাঁড়। সে নৌকা জানে নদীর কোথায় কতখানি নাব্যতা, সে জানে কোথায় আছে ঘুর্ণি, জলের মধ্যে পাক, যা নৌকাকে তলিয়ে নিয়ে যায় অতলে। সব সে পাশ কাটিয়ে চলতে থাকে নীরবে, জলের মধ্যে থেকে উঠে আসে না কোন শব্দ। ছয়-যাত্রী অনুভব করে এক ভৌতিক অনুভূতি, তারা কখনও নৌকা চড়েনি, আর তার প্রয়োজনও হয়নি।

মাত্র কয়েক পল, অনুপল, সেই নৌকা পৌঁছে দেয় যাত্রীদের পরপারে। পারে নেমেই যাত্রীরা মিলিয়ে যায় অন্ধকারে অরণ্যের গভীরে। সেই সময় সব জেগে উঠেছিল কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ, ভীষণ অনুজ্জ্বল। এই ছয় যাত্রী হলেন পঞ্চপাণ্ডব এবং তার জননী কুন্তী। আর যিনি বিশাল দেহী, তিনি হলেন মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন। মহাভারতের অন্যতম নায়ক হয়তো বা মহানায়ক, কিন্তু সে পায়নি সেই মর্যাদা।

দুর্যোধন তার মন্ত্রী পুরোচনের মন্ত্রণায় সৃষ্টি করে ছিল জতুগৃহ। উদ্দেশ্য পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারা। বিদুর তা জানতে পেরে আগে ভাগে জতুগৃহের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে রেখেছিলেন। সেই নৌকাটি ছিল স্বয়ংচালিত যন্ত্রযান। যে বাতাস ও তরঙ্গের আঘাত প্রতিসৃত করতে পারে : **ততো বাতাসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তা পতাকীনাম। উর্ম্মিং ছড়াং কৃত্বা কুন্তীমদযুবাচ হ।।** (আদিপর্ব ১৩৪ অধ্যায়) এসব কথা কুন্তীকে জানিয়ে দিয়ে ছিলেন তিনি। তারপর যাত্রাকালে তিনি প্রিয়পুত্র যুধিষ্ঠিরকেও কথাচ্ছলে কথ্যভাষায় উপমার মাধ্যমে নৌকা ও সুড়ঙ্গ ব্যবহারের যাবতীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই স্বয়ংযান কি কল্প কাহিনীর উপাদান? যদি তা না হয় তবে স্থলযানগুলি কেন স্বয়ংযান না হয়ে পশুচালিত যান ছিল সে সময়ে?

স্থলযানের প্রথম বিশেষ অঙ্গ হল চাকা। চাকা আবিষ্কারের পর স্থলযানের সৃষ্টি হয় এবং কালে কালে তার উত্তরণ ঘটে। প্রথম প্রথম যান পশুদ্বারা চালিত হতো, পরে স্বয়ং চালিত হয়। মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীতে স্বয়ংচালিত চাকার কথা জানতে পারি। যেমন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় সেখনে একটি স্বয়ংচালিত চক্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে শর চালনা করে তার উপরে স্থাপিত লক্ষকে যে ভেদ করতে পারবে সে দ্রৌপদীকে লাভ করবে এই শর্ত ছিল। অর্জুন সেই লক্ষভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল :

যন্ত্রং বৈহায় সঞ্চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম।
তেন যন্ত্রেণ সমিতং রাজা লক্ষ্যং চকার সঃ।। ১০ ।
ইদং সদ্য ধনুঃ কৃত্বা সদ্বৈর ভিঞ্চ সায়কৈঃ।
অতীতং লক্ষ্য যো বোদ্ধা স লব্ধ মৎসুতামিতি।। ১১ ।

(আদিপর্ব, ১২৩ অধ্যায়)

এছাড়া আমরা ফিরে যাই কুরু পাণ্ডবের কৈশোর কালের একটি কাহিনীর ঘটনায়। দুর্যোধন গঙ্গাতীরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। যেখানে ভীমকে খাদ্যের সাথে কালকূট বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। সেখানে একটি গৃহের গবাক্ষে একটি ঘূর্ণায়মান জলযন্ত্রের কথা বলা হয়েছে :

গবাক্ষ কৈ কথা জলৈযন্ত্রে: সঞ্চারি কৈরাপি।। ২৭ ।

আদিপর্ব, ১২৩ অধ্যায়)

এছাড়া আমরা গরুড় উপাখ্যানে একটিজ স্বয়ংচক্রের কথা জানতে পারি।। (আদিপর্ব, ২৮ অধ্যায়) গরুড় স্বর্গে অমৃত আনতে গেলে তার সাথে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। দেবতারা যুদ্ধে পরাস্ত হলে গরুড় যেখানে অমৃতভাণ্ড রক্ষিত আছে সেখানে যায় এবং দেখতে পায় সেই অমৃতভাণ্ডের সামনে একটি চক্র অনবরত ঘুরছে এবং তার ধারাগুলি ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ম। কাহিনীতে বলা হয়েছে দেবতাগণ মহা- কৌশলে এই চক্রটি তৈরী করেছিলেন। উদ্দেশ্য, যে অমৃতভাণ্ড হরণ করতে আসবে সে ওই ঘূর্ণায়মান চক্রে কাটা পড়বে!

আরো অনেক স্থানে স্বয়ংচক্রের সন্ধান আছে অথচ স্বয়ং কোন যন্ত্রযানের উল্লেখ না থাকায় আমরা সহজে অনুমান করে নিতে পারি এই স্বয়ং যন্ত্রগুলির অশ্বশক্তি খুব কম ছিল। এই দূর্বল— শক্তির জন্য সেই চক্র বা যন্ত্র পরিবহনে ব্যবহৃত হত না। এবং সহজে আরো অনুমান করতে পারি এই যন্ত্র বা চক্রগুলি ছিল বাযুশক্তির চালিত। নদীতে বায়ুদ্বার পালের সাহায্যে যে নৌ-চালনা হয় তা কিন্তু অংশত স্বয়ংযান চালনা। কিন্তু জতুগৃহদাহ বর্ণনায় আমরা যে স্বয়ং নৌকা যানের বিবরণ জানতে পারি তা আমাদের কৌতুহল বাড়িয়ে দেয়। জলে তরঙ্গাঘাতের বাধা থাকলে ও স্থলযানে চাকার ঘর্ষণ জনিত বাধা না থাকায় অশ্বশক্তিতে নৌচালনা সম্ভব। বরং একটু ভাবতে পারি বায়ুশক্তি দ্বারা পালের সাহায্যে নৌচালনার মত বায়ুকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করার কৌশল সে সময়ের বিজ্ঞান রপ্ত করেছিল। তবে তার শক্তি বর্তমান কালের থেকে দূর্বল সে কথা বলাই বাহুল্য। আর এর থেকে অনুমান করতে পারি সেই সময় ছিল যান্ত্রিক শক্তি ও যন্ত্র সভ্যতার শৈশবকাল পেরিয়ে যৌবনের উত্তরণ কাল।

স্থলপথে পশুচালিত যানবাহনের কথা আমরা জানি এবং এও জানি পশুচালিত যান পৃথিবীর আদিম যান। আজ যন্ত্র সভ্যতার শীর্ষ - বিন্দুতে পৌঁছেও সেই পশুচালিত যানবাহনের গুরুত্ব দেশে দেশে কম নয়। আজও আমাদের দেশে সেই যানবাহনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জলপথে জলজন্তু চালিত জলযানের কথা শুধু ভাবায় না আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। মহাভারতের বনপর্বের ১৫৮ অধ্যায়ে সেই জলযানের উল্লেখ আছে। অপরিসীম বিস্ময়ে প্রশ্ন জাগে সে কি সম্ভব? সম্ভব বা নয় কেন? স্থলপথে গোরু, মহিষ ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতিকে পোষ মানিয়ে যদি তাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা বা তাকে দিয়ে গাড়ী টানানো যাছ তাহলে পোষ মানিয়ে বৃহৎ মৎস্য বা জলজন্তু দ্বারা জলযান চালানো বা যাবে না কেন? হিন্দু দেবী গঙ্গার বাহন মকর তো আমাদের সুবিদিত। লৌকিক কাহিনী বনবিবির অনুচর ছিল বিশাল বিশাল কুমীর। বনবিবির সাথে দক্ষিণরায়ের যুদ্ধে কুমীরের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই যুদ্ধে কুমীর বাহিনীর উল্লেখ আছে। কাহিনী শেষে এক বিশাল কুমীর কাহিনীর নায়ক দুখেকে পিঠে করে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। সার্কাসে দেখি জলহস্তী ও মানুষের বশীভূত। আজ আধুনিক প্রযুক্তির যুগে পোষ মানিয়ে জলযান নামক মৎস্যকে নানান অসাধ্যসাধন কার্য্যে ব্যবহার করছে প্রতিরক্ষা বিভাগ, এমনকি তাদের কাজে লাগান হচ্ছে গুপ্তচর বৃত্তিতেও।

সুতরাং মৎস্য চালিত বা জলজন্তু চালিত জলযান শুনতে অভিনব বলে অবিশ্বাস যোগ্য নয়।

আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমুদ্রপোতের উল্লেখ থাকায় আমরা স্বাভাবিক কারণে অনুমান করতে পারি সে যুগের মানুষ বিশাল জলরাশিকে পরাস্ত করে তার বুকে যান ভাসিয়ে ছিল। এবং সেই যান ছিল দূরাদূরান্ত দ্বীপ দেশের যাতায়াত ও বাণিজ্যিক মাধ্যম। শ্লোকটি হল :

শ্রুত্বাদৌ ভবতি নৃনাং সুখাবগাহং
বিস্তীর্ণ লবণ জলং যথা প্লবেণ।।

বঙ্গানুবাদ : পোতদ্বারা যেমন লবণ সমুদ্র পার হওয়া যায়, তেমনি ইহা শুনিয়া এই বিশাল উপাখ্যান সহজে বোঝা যায়। ভারত কৌমুদীর টীকাকার জানিয়েছেন, প্লবেণ পোতদিনা, লবণ জলং যথা লবণ সমুদ্র।

স্থলে যেমন পশুদ্বারা যান চালানো হত এবং জল মৎস্য জাতীয় জলজন্তু দ্বারা নৌযান চালনা হত তেমনি পরিবহনে সে যুগে আকাশে ছিল পাখীর এক বিশাল ভূমিকা। আমরা মহাভারতের কাহিনী থেকে জানতে পারি গরুড় নামক এক বিশাল পক্ষী সেই ভূমিকা পালন করত। গরুড়কে নিয়ে বহু কাহিনী আছে। যেমন সে গালিবকে বহন করে নানা স্থান ভ্রমণ করেছিল। মহারাজ উপরিচরকে উদ্ধার করে এনেছিল। নিজের মাতা বিনতা ও সৎমাতা কদ্রুকে বহন করে একটি দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু দেবদেবীর বাহনের ক্ষেত্রে যেমন স্থলচর ও জলচর জীবের ভূমিকা আছে তেমনি খেচর পাখিদেরও ভূমিকা আছে। সরস্বতীর বাহন হাঁস তো সুবিদিত, সেটি তো একটি পাখি। হিন্দু দেবদেবীর বাহন আমাদের ইঙ্গিত দেয়, পরিবহনে জীবজন্তু ও পাখিদের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। আর মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে তারই সত্যতা। জীবজন্তুকে পোষ মানিয়ে তাদেরকে কাজে লাগানো প্রমাণ করে ভালবাসা এক মহৎ শক্তি।

মহাভারতেরও পূর্ব থেকে রথের ব্যবহার সুবিদিত। মহাভারতের যুগের রথ আরো গতি পেয়েছিল এবং সেই সব রথের অনেক যান্ত্রিক উন্নতি হয়েছিল। ফলে যেমন বহুদূরগামী হয়েছিল তেমনি হয়েছিল দ্রুতগামী। আর সাধারণ ক্ষেত্রে শিবিকা ও শকটের ব্যবহার হত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হলে, রমণসুখ অসম্পূর্ণ থাকার কারণে পরকালে সেই ভোগ অভীপ্সায় কুন্তীকে নিবৃত্ত করে মাদ্রী যোগবলে দেহ হতে আত্মাকে মুক্ত করে সহগামী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য সহমরণ বলে জোর করে চিতায় পুড়িয়ে মারাকে

সহমরণ বলে না, সেটি একটি নারকীয় হত্যা। সহমরণ হল স্বেচ্ছায় আত্মদান, এই কাহিনী তার যথাযথ প্রমাণ। তখন পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ শিবিকায় বহন করে সৎকারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর কুন্তী পুত্রদের দেখতে সেই সময় ব্রাহ্মণগণ এসেছিলেন বিভিন্ন স্থান হতে শিবিকা ও শকটে।

দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যগণ অর্থাৎ কুরুকুল রাজকুমারদের অস্ত্র শিক্ষার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে, তাদের অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শণের জন্য এক বিশাল মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে সাধারণ মানুষজন সেই অনুষ্ঠান দেখতে পারেন। পুরনারীরা যাতে সেই অনুষ্ঠান দেখতে পারে তার জন্য রাজ অর্থব্যায়ে বহু প্রকার শিবিকা নির্মিত হয়েছিল তাদের বহনের জন্য।

মহাভারতে উল্লেখ আছে এমন একটি দেশের যে দেশের নাম ভোজ। সেখানে কোন স্থলযান চিল না শুধুমাত্র নৌকা ছিল পরিবহন মাধ্যম। যযাতির অভিশাপে তার পুত্র দ্রুহ্যুর নির্বাসন হয়েছিল।

আমরা ফিরে যাই আবার রথের প্রসঙ্গে। মহাভারতের পাতায় পাতায় কোথায় কেমন রথের বর্ণনা আছে সেই আলোচনায়। রথের বাহন অশ্ব। আর গন্ধর্বদেশের অশ্ব ছিল সেই বাহন হিসাবে শ্রেষ্ঠ। এই অশ্বগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল প্রয়োজনে ক্ষীণ ও অক্ষীণ হতে পারে এবং কখনও বেগভ্রষ্ট হয় না। আর সুন্দর বর্ণনায়, **মৎস্যের ন্যায় বেগবান। গন্ধর্ব্ববাহাস্তে দিব্যবর্ণা মনোজবাঃ। ক্ষীণা ক্ষীণা ভবন্ত্যেতে ন হীয়ন্তে চ রংহসঃ।। ৪৯।।** গন্ধর্বদেশে ছিল হিমালয়ের পাদদেশে। অর্জুন যখন বনবাসে ছিল তখন তার সাথে এক গন্ধর্বের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং দুজনের মধ্যে শেষে এক সন্ধি হয়। সেই গন্ধর্ব অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা দান করে। এই বিদ্যার প্রভাবে ত্রিভুবনের সবকিছু দেখতে পাওয়া যায়। এবং রথের উপযুক্ত বিচিত্র অশ্ব দান করে আর তার বিনিময় অর্জুন গন্ধর্ব অঙ্গারপর্ণকে উত্তম আগ্নেয় অস্ত্র ও চির সখ্য দান করে । (আদিপর্ভ, ১৬৩ অধ্যায়)।

অর্জুন একটি রথ উপহার হিসাবে পেয়েছিল। নাম ইন্দ্ররথ। বনপর্বে সেই কাহিনীর বিবরণ আছে। এই রথটি ছিল মহারাজ জরাসন্ধের। জরাসন্ধ হত হলে কৃষ্ণ এটি হস্তগত করে। এই রথটি পূর্বে ইন্দ্রের ছিল তাই তার নাম হয় ইন্দ্ররথ। ইন্দ্রের কাছ হতে এই রথটি পায় রাজা বৃহদ্রথ। তখন এই রথের নাম হয় বৃহদ্রথ। তিনি ছিলেন জরাসন্ধের পিতা। ইন্দ্রের এই রথটি যেমন ছিল বিশাল তেমনি এই রথটি ছিল নানান রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত। ছিল সাজানো নক্ষত্রাকারে নানান হীরকখণ্ড, যার বর্ণ ছিল তপ্ত সুবর্ণের ন্যায়। এই রথে একটি সুউচ্চ ধ্বজা ছিল, যা বহুদূর থেকে দেখা যেত এবং কোন অস্ত্র বিদ্ধ হত না। এই ধ্বজাটির বৈশিষ্ট্য ছিল কোন বৃক্ষশাখা দ্বারা তার স্পর্শ হত না। এই রতের বর্ণনায় বলা হয়েছে এই ধ্বজাটি ছিল অসংলগ্ন। অর্থাৎ অনুমান করা যায় এই ধ্বজাটি সম্পূর্ণ স্থির ছিল না, প্রয়োজনে আপনা থেকে সঙ্কুচিত হত ফলে কোন বৃক্ষশাখায় ছোঁয়া লাগত না (বনপর্ব, ২৩ অধ্যায়)

মহাভারতের উদযোগ পর্বে পাই অর্জুনের যুদ্ধরথের বর্ণনা। দুর্যোধন যুদ্ধের প্রস্তুতি কালে বিপক্ষ শিবিরের প্রস্তুতি কেমন জানতে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করে অর্জুনের রথটি কেমন? সঞ্জয় তার উত্তরে জানিয়েছিল, 'এই রথটি তিনজনে মিলে পরিকল্পনা করে তৈরী করেছে। এই তিনজন হল দক্ষপ্রজাপতি, দেবরাজ ইন্দ্র এবং বিশ্বকর্মা। এই রথের রূপ ও গঠন নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর তবে তার রূপায়ন করা হয়েছে। এই রথের ধ্বজাটি অলৌকিক, সেই ধ্বজা হতে কিরণ নির্গত হয়, কোন বক্ষে সংলগ্ন হয় না, আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়। এর বর্ণ ইন্দ্রধনুর মত অর্থাৎ বহু বর্ণে রঞ্জিত। আর ধ্বজাটি ছিল অতিলঘু অর্থাৎ হাল্কা এবং অভঙ্গুর।

উপযোগ পর্বে পাই আর একটি রথের বর্ণনা, কৃষ্ণরথ। এ রথের বাহন চিল চারটি অশ্ব। তাদের নাম ও বর্ণ যথাক্রমে— শৈব্য, বর্ণ : শুক পাখীর পাখার ন্যায়। সুগ্রীব, বর্ণ : কিংশুক ফুলের ন্যায়। মেঘপুষ্প, বর্ণ : মেঘের ন্যায়, বলাহক : বর্ণ পাণ্ডুর। সম্মুখে দুটি অশ্ব ডাইনে শৈব্য আর বামে সুগ্রীব আর পিছনে দুটি। ডাইনে মেঘপুষ্প আর বামে বলাহক। আমরা জানি রথের বাহন অশ্ব সে যে কটি সংখ্যায় হোক সামনে থেকে রথ টেনে নিয়ে চলে। সূর্যের রথের ঘোড়া সর্বাধিক, সেখানে সাতটি ঘোড়া থাকে সামনে। কিন্তু এখানে সামনে দুটি এবং পিছনে দুটি। অর্থাৎ দুটি টানে আর দুটি ঠেলে। অর্থাৎ আধুনিক যুগের ট্রেনের মত। সুতরাং সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায়, এই রথের গঠন ছিল অন্যান্য রথের চেয়ে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিপূর্ণ। এই রথের ধ্বজে গরুড়ের অধিষ্ঠান ছিল এবং নানান জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কিত ছিল। গরুড়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধ্বজে বৃহৎ দুটি পাখা লাগানো ছিল যে পাখা দুটি বায়ুবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত এবং বায়ুশক্তিকে নৌকার পালের মত ব্যবহার করে রথের গতি বাড়াতে সক্ষম হতো আর সেই সাথে লাঘব হত অশ্বের শ্রম।

আর একটি ইন্দ্র - রথের পরিচয় পাই, এটি আসলে রথ নয় কারণ এর কোন বাহন ছিল না। কার্যত এটি একটি বিমান। মহাদেবের সাথে অর্জুনের ভয়ানক যুদ্ধের পর অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করে মহাদেরে নিকট হতে অস্ত্র লাভ করে। তখন চারদিক থেকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের তাকে নানান অস্ত্র দান করে এবং ইন্দ্র তাকে স্বর্গে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই রথটি পাঠিয়ে দেয়। এই রথটি স্থলযান নয়, আকাশে চলাচল করে সুতরাং একে বিমান বলাই সঙ্গত। কেমন ছিল সে বিমান? আমরা তার পরিচয় পাই ব্যাসদেবের বর্ণনায় : (বনপর্ব, ৩৭ অধ্যায়)।

অসয় শক্তয়ো ভীমা গদাশ্চোগ্র প্রদর্শনাঃ।
দিব্য প্রভাবঃ প্রাসাশ্চ বিদ্যুতশ্চ মহাপ্রভাঃ।।৪
তথৈ বাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তা স্থূলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ স নির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা।।৫
তত্র নাগা মহাকায়া জ্বলিতাস্যাঃ সুদারুনাঃ।
পীনাদ্রিকূট প্রতিমাঃ সংহতাশ্চ তথোপলাঃ।।৬
দশ রাজনঃ সহস্রানি হরীণাং বাতরংহসাম।
বহন্তি যে নেত্রমূষং দিব্যং মায়াময়ম রথম।।৭

এই বিমান ছিল কার্য্যত যুদ্ধ বিমান। এর ইঞ্জিন ছিল দশহাজার অশ্বশক্তি যুক্ত। ভারতকৌমুদীর টীকাকার শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ উক্ত শ্লোকের টীকায় জানিয়েছেন— অসয় ইতি। প্রাসা: কুন্তাঃ। স নির্ঘাতা, নির্ঘাত শব্দতুল্য শব্দকরা অসনায়ো বজ্রানি। নির্ঘাত লক্ষণং প্রাগুক্তম। চক্রাযুক্তা স্থানান্তর চালনায়েতি ভাবঃ তুলা অষ্ট তোলাকাত্মাক পলশত পরিমিতা: গুড়াঃ সীসক পাষাণাদি গোলকা যেষু তে তথা মহামেঘস্বর্নাশ্চ বায়ুনা বায়ুপ্রবেশন মাত্রনৈব স্ফুটান্তি গোলকানুদগীরন্তিতি বৃহৎ যন্ত্র বিশেষ কামাননাম্মা প্রসিদ্ধ বৃহন্নালী রূপা ইতর্থ

। গুড়: স্যদ গোলকে হস্তি সন্নহেযু বিকারয়ো: ''তুলা পলশতে রাশৌ বান্তে সদৃশোমানয়ো: ইত্যাদি চ বিস্ব। নাগাঃ সর্পাঃ নীনংস্থূলং যদ্রাকিকূটং পর্বতশঋঙ্গ তৎপ্রতিমাং স্তুতুলাং সংহতা পরস্পর সংশ্লিষ্টাঃ উপলাঃ প্রস্তরাঃ প্রস্তর গোলকাশ্চ, তত্ররথে আসন্নতি শেষঃ।

টীকাকারের বঙ্গানুবাদ ঃ সেই রথের ভিতরে ভীষণ ভীষণ তরবারি ও শক্তি, ভয়ঙ্কর গদা, অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন প্রাস। মহাপ্রভাবশালী বিদ্যুৎ, নির্ঘাতের তুল্য শব্দকারী বজ্র। মহামেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দকারী চক্র সংযুক্ত এবং কেবল বাযুর সাহায্যে দশ দশ সের ওজনের গোলা নিক্ষেপ করে এখানে বৃহৎ কামান বিশাল দেহ ও উজ্জ্বল মুখ ভয়ংকর সর্প এবং বৃহৎ পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় রাশিকৃত পাথরের গোলা বিদ্যামান ছিল। (৪-৬)। আর সেই বিমানের বায়ুরতুল্য বেগশালী অশ্বাকৃতি দশহাজার চালক যন্ত্র ছিল। সে যন্ত্রগুলি নয়নাকর্ষক মায়াময় সেই দিব্য বিমানখানাকে বহন করিত। ৭

উজ্জ্বল ভয়ংকর সর্প কথাটির বঙ্গানুবাদে উল্লেখ থাকলেও সম্ভবত তার সরল অর্থ হবে বিমানটির মুখটি ছিল ভয়ঙ্কর সর্পের মত। প্রচলিত বিমানগুলির মুখগুলি বর্তমানে তাই দেখা যায়। অনেকটা যেমন ময়াল বা অজগর সাপ। এই যানটি স্বয়ংযান। এর কোন বাহনের উল্লেখ না থাকায় এটি যে শক্তিচালিত তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এই শ্লোকের মধ্যে বায়ুশক্তির উল্লেখ থাকায় আমরা অনুমান করতে পারি এই বিমান বায়ুশক্তি পরিচালিত। এক সময় বায়ুশক্তির শক্তি সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন ধারণা ছিল না। বর্তমানে প্রচলিত শক্তির অপ্রতুলতার কারণে শুরু হয়েছে অপ্রচলিত শক্তি নিয়ে গবেষণা। এই গবেষণার ফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি বায়ুশক্তি বা মহাশক্তির সন্ধান। আজ বায়ুশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ ও তৈরী হচ্ছে। আকাশে বায়ুর অভাব নেই। নেই সূর্য রশ্মির। বিষয়টি মাথায় রাখলে অদূর ভবিষ্যতে এই দুই শক্তির মিলনে যে উদ্ভাবিত শক্তির সৃষ্টি হবে তা জ্বালানী শক্তির পরিবর্ত হিসাবে বিমান চালনা সম্ভব হবে এবং তা হবে অন্যতম একটি ব্যয় সংকোচ পরিকল্পনা। আর তারই সূত্র নিহিত আছে এইখানে।

আকাশযান হিসাবে মহাভারতের পাতায় বহু বিমানের উল্লেখ আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিতে যক্ষরাজ একটি বিশাল বিমান নিয়ে এসেছিলেন। সেই বিমানের যাত্রী ছিল একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, মরুৎগণ সাধ্যগণ ও যম।

দেবরাজ ইন্দ্র চেদিরাজ পুরুবংশীয় রাজা উপরিচরকে একটি বিমান দান করেছিলেন। এই বিমানটির বৈশিষ্ট্য ছিল স্ফটিক নির্মিত। তিনি সেই বিমান নিয়ে আকাশে বিচরণ করতেন বলে তার নাম হয়েছিল উপরিচর। এছাড়া মহাভারতের বহু বিমানের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন— সৌভ বিমান, বৃহৎ বিমান, আসুর বিমান প্রভৃতি। সৌভ বিমান ছিল মহারাজ শাল্বের। শিশুপাল কৃষ্ণ কর্তৃক বধ হলে শাল্ব এই যুদ্ধ বিমান দিয়ে কৃষ্ণের দ্বারকা নগরী আক্রমণ করেছিল। সৌভ রাজের বিমান, সৌভ বিমান, অন্যঅর্থে সমুদ্রের উপর ভাসমান বিমান। (বনপর্ব, ১৩ অধ্যায়) অসুর বিমান ছিল অসুরদের। অনুশাসন পর্বের ১৩৮ অধ্যায়ে অসুররাজ বিদ্যুৎমালীর তিনটি পুর ছিল। একটি লৌহময়, অন্যটি রৌপ্যময়, অবশিষ্টটি সুবর্ণময়। পুর শব্দের অর্থ এখানে বিমান।

আমরা এই আলোচনায় শুরুতেই দেখেছিলাম নৌচালনায় নারীর ভূমিকা। নারী যে গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকত না উক্ত কাহিনী তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় নারী ছিল স্বাবলম্বী। অর্থ উপার্জনেও তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কায়িকশ্রমে ও তার দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। মৎস্যগন্ধা পারাপার করত জলযান— নৌকা আর অনুশাসন পর্বে আমরা দেখতে পাই কৃষ্ণ পত্নী রুক্মিনী করছে রথ চালনা। কাহিনীটি যেভাবে বিন্যস্ত তা অত্যন্ত কুয়াশাপূর্ণ। বিশ্লেষণ করলে কুয়াশা কেটে একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে।

একদা কৃষ্ণ তার পুত্র প্রদ্যুম্নকে তার মাতা রুক্মিনী ও দূর্বাসার কাহিনী শোনায়। এই কাহিনী শোনানোর অন্যতম কারণ ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণ্যবাদে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। অথবা প্রকারন্তরে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। দুর্বাসা ছিল এক বরগারী ব্রাহ্মণ তাকে কেউ কখনও খুশী করতে পারত না। সেই ব্রাহ্মণ একদিন কৃষ্ণের বর্ণময় প্রাসাদে এসে কৃষ্ণের কাছে পায়েস খেতে চাইল। প্রদ্যুম্নমাতা রুক্মিনী সেই পায়েস রান্না করে এনে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করতেই সেই ব্রাহ্মণ সেই পায়েস না খেয়ে সারা শরীরে মাখাতে থাকল। এবং রুক্মিনীকে মাখাতে থাকল। শেষে রুক্মিনীকে রথে সংযুক্ত করে গৃহ হতে বেরিয়ে যায় এবং এই ঘটনা ঘটে কৃষ্ণের সামনে। এমনকি তারই সামনে তার স্ত্রী শরীরের উপর দূর্বাসা কশাঘাত করে। কৃষ্ণ এ দৃশ্য দেখে মোটেও বিচলিত হয় নি। কশাঘাতে রুক্মিনী রথ থেকে পড়ে গেলে দূর্বাসা রথ থেকে নেমে হেঁটে চলে যেতে থাকলে কৃষ্ণ ছুটে গিয়ে দুর্বাসাকে নিবেদন করে বলেন — প্রসন্ন হউন। তখন দুর্বাসা কৃষ্ণকে বলেন, তুমি ক্রোধ জয় করিয়াছ, তুমি বর প্রার্থনা কর।

কাহিনীটির মূল উদ্দেশ্য সুচতুর ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই করতে গিয়ে কাহিনীটি অনেক ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। কাহিনীটি পড়লে মনে হয় এখানে রুক্মিনী অশ্বের ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার একটি নারী কেন, একাধিক পুরুষের পক্ষে অশ্বের মত রথ টানা সম্ভব নয়। সুতরাং সহজ সিদ্ধান্ত দূর্বাসার আদেশে রুক্মিনী রথ চালনা করেছিলেন এবং কৃষ্ণকে উত্যক্ত করার জন্য তার শরীরে কশাঘাত করেছিলেন। ঘটনার সত্যতা নিরূপণের দায় না থাকলেও সেকালের নারীরা যে স্থলযান, জলযান চালনা করতেন বা করতে পারতেন তার ছায়া মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তাই আজ বিশেষ প্রয়োজন মহাভারতের প্রকৃতকাল নিরুপণের। ভারত যে প্রাচীনকালে যান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত ছিল এই সংক্ষিপ্ত যান - বাহন আলোচনায় তার প্রমাণ মেলে। শুধু তাই নয় ভারত যে বায়ুশক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার জানত মহাভারতের বহু - কাহিনী তার প্রমাণ। শক্তি দেবতা হিসাবে বায়ুর উল্লেখ আমাদের চিন্তা ভাবনাকে আরো বেশী প্রতিষ্ঠা করে। তাই সহজ ভাবে বলতে পারি বহু প্রাচীন কালে ভারতে উন্নত যানবাহনের প্রচলন ছিল এবং যান্ত্রিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

* অনুসরণ— শ্রীমদহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত 'মহাভারতম' (বিশ্ববাণী সংস্করণ)।

লেখক পরিচিতি : প্রবীণ মহাভরত গবেষক, গ্রন্থকার।